২.৩.১৫

৫. মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা কর।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বীরাঙ্গনা' বাংলা সাহিত্যের একমাত্র পত্রকাব্য। মধুসূদন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনার আদর্শ লাভ করেছিলেন পাশ্চাত্য রোমক কবি Ovid-এর "The Heroides or Epistles of Heroines" নামক পত্রকাব্য থেকে। আর এই কাব্যে মধুসূদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

পাশ্চাত্য আদর্শে মধুসূদন :—

বাংলা সাহিত্যে পত্রকাব্য রচনার আদর্শ ছিল না। মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং শেষ পত্রকাব্য রচয়িতা। মধুসূদন এই 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনার আদর্শ লাভ করেছিলেন রোমক কবি Ovid-এর The Heroides or Epistles of Heroines নামক পত্রকাব্য থেকে। Ovid-এর কাব্যে একুশটি পত্র ছিল। মধুসূদনও চেয়েছিলেন একুশটি পত্র রচনা করবেন কিন্তু মাত্র এগারোটি পত্র রচনা করেই বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশ করেছিলেন। Ovid তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'The Heroides'. আর মধুসূদন তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন 'বীরাঙ্গনা' Ovid-এর মতো মধুসূদনও পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন। আর এ থেকেই বোঝা যায় মধুসূদনের উপর পাশ্চাত্য রোমক কবি Ovid-এর প্রভাব প্রতিভাত হয়েছে।

পাশ্চাত্য প্রভাব :—

Ovid-এর কাব্যের কোনো নারীর সমজাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যখন 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে কোনো নারী এসেছে তখন তৈরি হয়ে গেছে পাশ্চাত্য প্রভাব। Ovid-এর কাব্যের চতুর্থ পত্রের নায়িকা 'ফেড্রা' মধুসূদনের তারার মতোই নবযুবতী। বয়স্ক স্বামীর সাথে ফেড্রার সংসার জীবন সুখের ছিল না। তারা যেমন স্বামীর শিষ্য অর্থাৎ সন্তান তুল্য সোমদেবকে চিঠি লিখে বলেছেন

Scanned by CamScanner

"কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে
তারানাথ!"

~~অথবা~~ আবার

"এ নব যৌবন বিধু অর্পিব গোপনে
তোমায়।"

— একই রকম কথা আমরা শুনেছি ফেড্রার কণ্ঠে। ফেড্রা অতীব সুন্দর সুপুরুষ বীর যুবক হিপ্পোলিটাসকে তীব্র ইন্দ্রিয় সুখের কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন —

"No blame will you receive
but praise instead
Safe at my side
and even in my bed."

আবার 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' পত্রে দেখি অর্জুন সুরপুরে গেছে অস্ত্রশিক্ষা করতে। সেখান থেকে অর্জুনের ফিরতে দেরি হওয়ায় দ্রৌপদী অর্জুনকে চিঠি লিখেছেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য —

"কি কহিনু নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে!"

— একই ভাবে 'ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপা' এর পত্রিকায় পেনিলোপা দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা ইউলিসিসকে দ্রুত চলে আসতে বলেছে —

"Ulysses, the penelope sends this to thee, thus dealying; but write me nothing in answer, do thou come thyself."

'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' একটি অনুযোগ পত্রিকা। এই পত্রে রানী কৈকেয়ী রাজা দশরথকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন —

"পরম অধর্মাচারী রঘু কুল-পতি।"

আর তখন আমাদের মনে পড়ে যায় 'ডেমোফোনের প্রতি ফিলিস' এর কথা।

প্রাচ্য প্রভাব :-

মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যে যেমন পাশ্চাত্য কবি Ovid-এর প্রভাব আছে, তেমনি আছে প্রাচ্য তথা ভারতীয় উপাদানের প্রভাব। বীরাঙ্গনা কাব্যের এগারোটি পত্রের মধ্যে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী' 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী' 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা' 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী' 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' - এই ছয়টি পত্রিকা। রামায়নের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে - 'দশরথের প্রতি কেকেয়ী', 'লক্ষ্মনের প্রতি সূর্পনখা'। আর অন্যান্য পুরান অবলম্বনে রচিত হয়েছে — 'সোমের প্রতি তারা' 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী' 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিনী' - এই তিন পত্রিকা।

মধুসূদন তাঁর কাব্যের চরিত্রগুলিকে রামায়ন মহাভারত ও পুরানের চরিত্রের হুবহু অঙ্কন করেননি। যুগের প্রভাব অনুযায়ী এবং নিজ ভাবনার বিকাশ অনুযায়ী চরিত্রগুলির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে অধ্যাপক ধ্রুবকুমার বলেছেন — মধুসূদন চরিত্রগুলির নবভাষ্য রচনা করেছেন।

মধুসূদন তারা পত্রিকার বীজ পুরান থেকে সংগ্রহ করলেও পুরানে তারার কাহিনী যেভাবে বিবৃত হয়েছে মধুসূদন সে ভাবে তারার কাহিনীকে গ্রহন করেননি। পুরানে তারা দেবী ছিল সতী নারী। কিন্তু মধুসূদনের হাতে তারা সতীত্ব ধর্মকে জলাঞ্জলী দিয়ে পুত্রতুল্য সোমদেবকে প্রেম নিবেদন করেছেন। তাই পত্রের শুরুতে তারা নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন।

বীরাঙ্গনা কাব্যে পৌরানিক উপাদান গৃহীত হওয়ার ফলে তার পরিবেশ পরিস্থিতি সমস্তই প্রাচ্য ভাবধারার সংবহ। ঋষি কন্বের আশ্রম বর্ণনা, বৃহস্পতির আশ্রম বর্ণনা, যুদ্ধ পরিস্থিতি, স্বর্গের রূপ বর্ণনা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর মধ্যে ব্রহ্মচর্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় পূর্ণ।

Scanned by CamScanner

পরিশেষে বলা যায়, 'বীরাঙ্গনা' মধুসূদনের একমাত্র পত্রকাব্য। যা বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শেষ পত্রকাব্য। মধুসূদন এই কাব্য রচনা করতে গিয়ে শুধু প্রাচ্য নয় পাশ্চাত্য কাব্যকেও অনুসরণ করেছেন। এমনকি তাঁহার মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছে বাংলা সাহিত্যের অমর পত্রকাব্য বীরাঙ্গনা।

5. আলোচনা: **সোমের প্রতি তারা**

"দুর্দিনে মূলে আছে কাম
সেই কাম দুর্জয় দুর্বার।"
— মোহিতলাল মজুমদার।

মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের নায়িকা তারার ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই কামনার তীব্র প্রকাশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে মধুসূদন রোমান কবি Ovid-এর The Heroides or epistles of Heroines- নামক পত্র কাব্যের অনুসরণে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা'। সেই কাব্যের 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকার নায়িকা তারাকে অঙ্কন করেছেন পুরাণের আদর্শ বর্জন করে। একেবারে রক্ত-মাংসের জৈব প্রবৃত্তির এক নায়িকা রূপে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তারা নিষ্ঠাবতী সতী নারী। তারা মন্দাকিনীতে স্নান করে যখন ফিরে আসছিল তখন সোম বা চন্দ্র তাকে দেখে কামাসক্ত হলে তারা সোমকে নানা কথা বলে বিরত করার চেষ্টা করে। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী এবং মাতৃতুল্যা গুরু-পত্নীর প্রতি কামাসক্ত হলে তা শত ব্রহ্ম হত্যার সমান পাপ হবে - এ কথাও জানিয়ে দেয় তারা। তবু সোম তাকে অপহরণ করে এবং বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে। তারপর শুক্রাচার্যের আদেশে তারাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

মধুসূদন পুরাণ কাহিনীর তারাকে রেনেসাঁসের আলোয় নতুন করে উপস্থাপন করেন। মধুসূদনের চন্দ্রে অর্থাৎ সোমের চরিত্রে কোনো কামুকভাব দেখা যায়নি। অপরদিকে গুরুপত্নী তারার মধ্যে দেখা গেছে প্রেম পিপাসা। পরিপূর্ণ নারী হিসাবে তারা তার যৌবনকে অস্বীকার করতে পারে না। সোমদেব আশ্রমে আসার পর থেকেই তারার নিজেকে নতুন মনে হয়েছে। এমনকি মনে জেগেছে আনন্দের জোয়ার —

"সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,— ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে!"

তারার মনে হয়েছে সোমের মধুমাখা স্বর বীনার সুরের চেয়েও মধুর। সোমকে সন্তান দিতে না পারা ভাব তারার কাছে অসুর হয়নি। তাই চিঠির শেষ দিকে তারা নিজেকে একেবারে অনাবৃত করে ফেলেছেন। দেহ সম্বন্ধে স্থাপনের তীব্র আকুলতা প্রকাশ করেছেন —

"এ নব যৌবন, বিধু অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা মণি।"

পরমুহূর্তে তারার মনে হয়েছে ভয়ঙ্কর পারিণামের কথা। তাই শেষ পর্যন্ত সোমের হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে তারা —

"কি আর কহিব?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।"

সিগমণ্ড ফ্রয়েড তার মনো বিশ্লেষণে জানিয়েছেন — 'Sex is the main spring of our unconsgious life.'

তারার বেলাতেও তা আমরা দেখি। নারীদের প্রেমের চাহিদা তারাকে এক ভিন্ন নারী করে তুলেছে। তারা যেন রক্তমাংসের প্রানবন্ত নায়িকা।

তারার মধ্যে জৈব প্রবৃত্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের প্রাবল্যে সমাজের শাসনের কথাকে দূরে ঠেলে দেয় তারা। এমনকি ক.সংগৌরব মনে হয় তুচ্ছ। আত্মসমর্পনের প্রবল ইচ্ছা লেখনির ভাষায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। একদিকে স্বামী - গুরু স্বামীর, অন্যদিকে দেহপ্রেমের প্রাবল্য - এ দুয়ের দ্বন্দ্ব তারাকে যথার্থ জীবন্ত করে তুলেছে। সমালোচক অজিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও সে কথা বলেছেন —

"একদিকে চিরাচরিত অতীন্দ্রবোধ আর একদিকে তীব্র প্রনয় আকাঙ্খা - যা ন্যায় - অন্যায়, উচিত অনুচিত বোধ লণ্ড ভণ্ড করে দেয়।"

— তারার এই দ্বিমুখী ভাব মধুসূদন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বর্ণনা করেছেন।

তারার চরিত্র নির্মাণে মধুসূদনের শিল্পী মানসিকতার যে দিকগুলি ক্রিয়াশীল ছিল তা একে উল্লেখ করা হলে —

ক) পরিমিত শিল্পবোধ :-

তারার চরিত্রে দেহ প্রবৃত্তির দিকটি উন্মোচিত করতে গিয়ে মধুসূদন কখনো শিল্পধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি। তাই তারার মধ্যে অযাচিত অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট নয়।

খ) পুরাণ আদর্শকে প্রত্যাখ্যান :-

নতুন যুগে নতুন মানুষের কথা নব অমৃতার কথা তারা চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যেহেতু আদর্শের দোহাই দিয়ে জীবনকে ব্যর্থ করার কোনো মানে হয় না, সেহেতু পুরাণের আদর্শ তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এখানে। তবে বড়ো হয়ে উঠেছে জীবনের চাহিদা।

গ) দেহপ্রেমের প্রকাশ :-

মধুসূদনের তারা চরিত্রে দেহপ্রেমের কথা ঢাকা থাকে না। তারা তার প্রতিটি পত্রিকায় দেহপ্রেমের আকুলতা প্রকাশ করেছেন। যেমন -

'এ নব যৌবন, বিধু অর্পিব গোপনে
তোমায়।'

পরিশেষে বলা যায়, তখন পুরাণের নায়িকা তারার জন্মান্তর ঘটে যায়। যুগে-যুগে সতে থাকা অসংস্কৃত যৌবনকে সে ব্যর্থ হতে দিতে চান না। জৈব প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাকে অতুলনীয় জীবন্ত করে তুলেছে। মনে হয় তারা যেন একেবারে জীবন থেকে উঠে আসা চরিত্র। জীবনের কথা বলার চরিত্র —

"রান্না ঘরে উনোনের কাছে সমস্ত দিন তোমার সাথে, তুমি শুধু রাতিবেলা খেলার ছলে শরীর নেবে। আর ফুরিয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলবে যেমন বালিশে পা জড়িয়ে অন্যদিকে।"

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষ খেয়া' কবিতায় কবির যে জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

"তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

— সেই ডাক ছিল জীবনদেবতার ডাক। মর্ত পৃথিবীর কবি অমর্ত্য অসীমের স্থানে আহ্বান পান। সেই আহ্বানে কবির মন আনচান করে ওঠে। রূপ জগতে জীবচর্চা করে অরূপ জগতে পাড়ি দিতে মনস্থির করেন। 'শেষ খেয়া' 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। 'শেষ খেয়া'-তে ফুটে উঠে রবীন্দ্রনাথের সেই বিশেষ সময়ের জীবন চেতনা।

'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠেছে কবির ভগবৎ অনুভূতির এক ~~বিশেষ~~ নতুন রূপ। তত্ত্বের উপলব্ধি এক রহস্য অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। কবি অনুভব করতে পারছেন বোধের প্রত্যক্ষ বস্তু যেন সরিয়ে দেয় তার ইঙ্গিত, সংকেত, সম্ভাবনা। ভগবান তার প্রেম-বিশ্বময় বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত বিরাট মূর্তি ত্যাগ করে একেবারে লীলাময় হয়ে উঠেছেন। কবির কাছে কখনো তিনি রাজা কখনো ভিখারি, কখনো প্রিয়তম, কখনো দাতা। সেই ঐশ্বর্যবিহীন জগতে কবি এবার পাড়ি জমাবেন। মর্ত-জীবনের সমস্ত বাধন ঘুচিয়ে অরূপলোকে অকাতরে জীবনে প্রবেশ করবেন: —

"তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘরছাড়া —
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিন শেষের শেষ খেয়ায়।"

— এতদিন কবি সংসার জীবনকে গ্রহণ করেছেন। সংসারিক কর্মের মধ্যে গৃহের শান্তি আরাম, স্নেহ প্রেমের বিচিত্র

লীলার মধ্যে নিজেকে সমর্পন করেছেন। জগৎ ও জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য মাধুর্যকেই জীবনের একমাত্র সত্য বলে গ্রহন করেছেন। কিন্তু সেই জাগতিক ও মানসিক রসের ভোগ আকাঙ্খা কবিকে এখন আর আনন্দ দিতে পারে না। তাই জীবনের শেষ বেলায় কবির প্রশান্ত মনে দেখা যায়' অন্তরাত্মা জীবনে প্রবেশের আকুলতা। কবি মানস জগতে দেখতে পাচ্ছেন সুবর্ণ তরী ভেসে যায় সেই অরূপ জগতে। কবি বুঝতে পারেন এখনই ওই তরীতে উঠতে হবে, নইলে বড়ো দেরি হয়ে যাবে। কবি সেই অরূপ জগতের ডাক শুনতেও পাচ্ছেন —

"ভাবলে আমি অনেক থামি হেথায় পাড়ি ধরবে সে।"

কবি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত কিন্তু তবু মনের মধ্যে যেন এক দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঘনীভূত, কে কবিকে নিয়ে যাবেন। তিনি যে ঘর আর পারের মাঝখানে বসে আছেন —

"ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে,
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যা বেলা কে ডেকে নেয় তারে।"

'সোনার তরী' পর্বে কবি দেখতে পেয়েছিলেন জীবনদেবতা। কিন্তু কবি তখন মর্ত জীবনরস পানে বিভোর। তাই খেয়া পারাপারের এত প্রকাশ পায়নি তখন। কিন্তু এখন সময় এসেছে তাই দেখা গেছে তীব্র আকুলতা।

রবীন্দ্র সমালোচক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষন করে যে কথা বলেছেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন —

"খেয়াতেই রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক কবিতার আরম্ভ। অসীম অরূপ লীলার ছলে নানাবেশে কবির চিত্তে দেখা দিয়া যাইতেছে, আর নানা স্পর্শে তার হৃদয়ে নানা রসের উৎস খুলিয়া যাইতেছে।"

বলাবাহুল্য সেই অসীমের জীবনদেবতায়

লীলা চাঞ্চল্যের অবসান কবি চাওয়া 'শেষ খেয়া' কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। জীবন দেবতার দেশই আত্মিক জগৎ। আর সেই আত্মিক জগৎকে ফুটিয়ে তোলার জন্য আধ্যাত্মিক ভাষাই উপযুক্ত। কেননা —

'Symbalism is the language of mystic.' তাই এই কবিতায় 'খেয়া' 'সুরের খেলা', দিনের শেষ, 'ভাঁটার টান', 'তরী', 'ডাক' প্রভৃতি শব্দগুলি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় অভিনব।

কবিতার চরণগুলির ও বাচ্যার্থের তেমন মূল্য নেই। এখানে রয়েছে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ও অরূপ জগতে যাওয়ার ব্যঞ্জনা। মর্ত জগতের সমস্ত পাট চুকিয়ে আধ্যাত্ম জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করা। এই জীবনে প্রবেশের জন্য যে ত্যাগ, বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও প্রশান্ত মনের প্রয়োজন এতদিন যেন তা সম্ভব ছিল না। প্রিয়জনের জন্য রূপ ভোগের আকর্ষণ ও নানা কর্মের প্রতি নিষ্ঠুর টানের জন্য এতদিন কবি খেয়া পারাপার করতে পারেননি। কিন্তু এখন দিন শেষে কবি জীবন দেবতার দেশে যাবার জন্য তৈরি —

"ওরে আয়,
আমারে নিয়ে যাবি কে রে
বেলা শেষের শেষ খেয়ায়।"

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্র জীবন দর্শনের একটি বিশেষ দিক ধরা পড়েছে 'শেষ খেয়া' কবিতায়। সেই 'সোনার তরী' পর্বে জীবনদেবতার আশ্রয় পেয়েছিলেন কবি। কিন্তু তখন কবি মর্ত জীবন রস পানে বিভোর। পরিপূর্ণ-অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশের অনুপ্রেরণা পাননি। 'খেয়া' পর্বে এসে সেই অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশের আকুলতা তীব্র ভাবে প্রকাশ পেল। কবি পরিপূর্ণ ভাবে জীবন দেবতার জগতে যেতে তৈরী। বেলা শেষের শেষ খেয়া তিনি আর ছাড়বেন না —

"ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে।"

ধর্মমোহ (পরিমার্জিত) — সঙ্কলিতা - 2 time - 31m (1×12 = 12) ০

1. 'ধর্মমোহ' কবিতাটি যথার্থ মানবিকতার কবিতা' — আলোচনা কর।

OR

'ধর্মমোহ' কবিতায় প্রচলিত ধর্মীয়তার বাইরে এসে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন — আলোচনা কর।

"আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেব লোক থেকে মানব লোকে।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

— এই মানবতার নিবিড় উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়। 'ধর্মমোহ' কবিতায় কবির ধর্ম বিশ্বাসের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ধর্মীয়তার বাইরে এসে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করেছেন। ফলে কবিতাটি হয়ে উঠেছে যথার্থ মানবিকতার কবিতা।

আসলে ধর্ম কী? এই প্রশ্ন কবি রবীন্দ্রনাথকে বারবার তাড়িত করেছে। একটি প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল —

"একথা মানিতে হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু - মুসলমানদের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্য ভেদ সেখানে অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্র মতে বাহ্য আচরণকে মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্মমত বড়ো অশান্তির কারণ। ~~এখন তার কিছুই হয় না~~।"

রবীন্দ্রনাথের ধর্মচেতনার পরিধিটি প্রথানুগ ধর্মীয়তা থেকে অনেকটাই আলাদা। আলোচ্য 'ধর্মমোহ' কবিতায় ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হানাহানির বিরুদ্ধে কবির তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

ধর্ম যখন তার কল্যাণময় স্বরূপ ভুলে মোহের মতো মানুষকে আচ্ছন্ন করে দেয়, তখন সে কেবলই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করে ~~না~~ নিজেও ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকার হয়ে নির্দয় হয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মীয়তার হানাহানিতে মত্ত মানুষ যখন মানুষকে মারিতে পারিতে হয়,

Scanned by CamScanner

তখন মুছে যায় মানবিকতার সমস্ত চিহ্ন। কবি মনে করেন, যে মানুষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে নাস্তিক সে অনেক ভালো —

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।"

— নাস্তিকের জ্ঞানতপস্যা, মননচর্চা, শুভতর মানবকল্যাণেই নিয়োজিত হয়। তাই শাস্ত্র না মেনেও নাস্তিক মহৎ।

যে মানুষ অন্য ধর্মের মানুষকে আঘাত করে অন্যধর্মের প্রতি ঘৃণায়-বিদ্বেষে অন্ধ, সে আসলে নিজের ধর্মকেও আঘাত করে। ঈশ্বরচেতনা বা দেবতা পূজার শারিতে আঙিনায় যে মানুষের রক্তমাখা পতাকা উড়িয়ে দেয়, ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মীয়তার নামে আসলে সে শয়তানের আরাধনা করে —

"বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে।"

হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও ধর্মীয় মৌলবাদে যে মানুষ আচ্ছন্ন সে এই সমস্ত অমানবিকতাকে নিজ ধর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। যদিও অবশেষে সেই মানুষকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয় ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ের মধ্যে। কবি বিশ্বাস করেন মহাকাল কোনো সময়ই এই অমানবিক হিংস্রতাকে মেনে নেবে না। কেননা তার হাতে আছে সম্মার্জনী - যা দিয়ে সে মুছে দেবে ইতিহাসের কলঙ্কময় হানাহানি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম আসলে মুক্তিরই ভিন্ন নাম। কবিতার শেষে কবি আহ্বান করেছেন প্রকৃত মানবিক ধর্মের পূজাবেদিতে যারা মানবিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত হিংসাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেই পূজাবেদিকে ভেঙে ফেলতে। ~~কবি আহ্বান জানিয়েছেন~~। সেই বিদ্বেষপ্রসূত ধর্মীয়তা কবির কাছে নিষ্প্রয়োজন। তাই অন্ধ, মূঢ়-অজ্ঞান ধর্মের বিরুদ্ধে কবি চেয়েছেন জ্ঞানের আলো জ্বালাতে —

যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে

ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

[এই ভাবে প্রচলিত ধর্মীয়তার বাইরে এসে কবি আলোচ্য কবিতায় মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন।]

পরিশেষে বলা যায়, 'বহু চিন্তা হল মানবিকতার এক প্রশস্ত পরিসর।' কবি কোনো মতেই এখানেও ধর্মান্ধতায় মানুষকে আচ্ছন্ন করতে চাননি। আশাতভাবে তিনি ~~ধর্মান্ধ মানুষের উপর~~ নাস্তিক মানুষকে ধর্মান্ধ মানুষের উপরে স্থান দিয়েছেন। ধর্মের মোহ মানুষকে যুক্তিহীন করে। মুক্তিচিন্তাকেই সে বন্দি করতে শেখায় এবং প্রেমচেতনাকে অবাধে বিনষ্ট করতে চায়। তাই আলোচ্য 'ধর্মমোহ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত ধর্মীয়তার বাইরে এসে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং ~~মান~~ মুক্তকণ্ঠে মানবতার জয়গান করেছেন।

Scanned by CamScanner

মানসী ১৫ × ১ = ১৫

1. মানসী কাব্যগ্রন্থের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে প্রেম চেতনার ধারা প্রকাশ পেয়েছে তার পরিচয় দাও।

অথবা

'নিষ্ফল কামনা' কবিতার ভাব-বিষয় পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্র প্রেমদর্শনের স্বরূপ যেভাবে ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

"ভালোবেসে সখী নিভৃত যতনে
আমার নামটি লেখ তোমার মনের মন্দিরে।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সারা রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যেই রবীন্দ্র প্রেমদর্শনের অতুলনীয় অনন্য সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেহাতীত প্রেমের রূপকার। 'ভগ্ন হৃদয়' থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কাব্যপথ পরিক্রমায় সেই দেহাতীত প্রেমের রূপ সৌন্দর্য আমরা দেখি। 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যগ্রন্থে দেহপ্রেমের ভোগবাসনাকে অতিক্রম করে দেহাতীত প্রেমের যথার্থ পথ খুঁজে নিয়েছেন তিনি। তার দেহাতীত প্রেমের পথ অনুধ্যানে 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি এক প্রতীক কবিতা হয়ে আছে।

"তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও আমার ভালোবাসার ধন!" — রবীন্দ্রনাথ।

'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় কবি মনে মানসী প্রিয়া অনবরত গুঞ্জন করে। রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্ন সৌন্দর্য তাকে নিয়ে মুকুলিত হতে চায়। কামনার জাগরণ ঘটে —

"দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।"

তাকে কেন্দ্র করেই কামনার ~~ত~~ প্রবেশ ঘটাতে চায়। অবিচ্ছিন্নভাবে তাকে পেতে ইচ্ছে করে। অবশ্য দেহপ্রেমের এই উচ্ছ্বাস সেক্ষেত্রে স্থায়ী হয় না। দেহপ্রেমকে অতিক্রম করার অভিলাষেই ফুটে উঠে কবিতায় দেহাতীত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। শুধু দেখতে ইচ্ছে করে সেই

Scanned by CamScanner

আসে। কবি উপলব্ধি করেছেন বাসনার ছুরি ব্যবহার করে প্রেমকে পাওয়া যায় না। দেহাতীত প্রেমের ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই প্রেমের যথার্থ রূপ সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আর সেই প্রেমের কথাই আলোচ্য কবিতায় ব্যক্ত করেছেন কবি —

লও তার মধুর সৌরভ
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী —
চেয়ো না তাহারে।

— তাহলেই প্রেমের অমৃত আস্বাদন সম্ভব। ভালোবাসার যে অমৃতের অন্বেষণে মানুষ যুগে যুগে পাগল হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে ভোগ বাসনায় সেই প্রেম ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। তাই কবির উপলব্ধি —

"মিটাও বাসনা বহ্নি নয়নের নীরে।"

কবি যখন 'মানসী' কাব্যের কবিতাগুলি রচনা করেন তখন কবির বয়স ২৭ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি রচিত হয়েছে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১৩ ই অগ্রহায়ন। অর্থাৎ কবির বয়স তখন ২৭ বছর। একেবারে যুবক তিনি। দেহপ্রেমকে অস্বীকার করা সহজ ছিল না। কিন্তু সেই দেহপ্রেম তথা দেহাতীত প্রেমের সংঘর্ষ মানসীর একাধিক কবিতায় ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, শুধু প্রেম, 'সুরদাসের প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতাগুলির কথা উল্লেখ করা চলে।

'নিষ্ফল কামনা' - তে যে দেহাতীত প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় পরবর্তীকালে তাই আমরা দেখি 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী' ও 'বলাকা' র একাধিক কবিতায়। সর্বোপরি দেখা যায় 'মহুয়া' কাব্যের কবিতাগুলিতে যেখানে দেহাতীত প্রেমের রূপসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। আবার রবীন্দ্র উপন্যাসের দিকে তাকালেও আমরা এই দেহাতীত প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখি। 'চোখের বালি' - তে বিনোদিনী বিহারীর

প্রেম। 'গোরা'-তে গোরা ও সুচরিতার প্রেম, 'ঘরে-বাইরে'-তে নিখিলেশ-বিমলার প্রেম, 'চতুরঙ্গ'-তে শচীশ-দামিনীর প্রেম, 'শেষের কবিতা'-য় অমিত লাবণ্যের প্রেম দেহাতীত প্রেমসৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে।

'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় রবীন্দ্র প্রেমদর্শনের যে স্বরূপ অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে তা এবার চিহ্নিত করা চলে —

ক) দেহপ্রেম-দেহাতীত প্রেমের সংঘর্ষ:—

'মানসী'র কালপর্বটি ছিল কবি জীবনের প্রতিষ্ঠা পর্ব। কবি তখন পূর্ণ যুবক। ভোগ বাসনার জগতে রূপরস আস্বাদনে মুগ্ধ। তার তাই 'নিষ্ফল কামনা'-তে কবির মধ্যে বাস্তব রূপ-রসের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং বাস্তবাতীত সৌন্দর্য প্রেমের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা - এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। দেহপ্রেমের উন্মাদনাকে জয় করার তীব্র আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে কবির মধ্যে। তাই কবিতার শুরুতে দেহপ্রেমের উত্তেজনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন কবি।

খ) দেহাতীত প্রেমের প্রতিষ্ঠা:—

'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় শেষ পর্যন্ত দেহাতীত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। কবি উপলব্ধি করেছেন বিরহতেই প্রেমানুভূতির চরম আনন্দের প্রকাশ ঘটে। দেহধর্মের দ্বারা আবদ্ধ প্রেম সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ বাস্তব কামনার দ্বারা লাঞ্ছিত। দেহ সম্বন্ধ যেখানে নেই সেখানে সেখানেই প্রেমের মুক্তি, প্রেমের সর্বজনীনত্ব। এই প্রেম অন্তরের সামগ্রী। বৈষ্ণব রস শাস্ত্রের পরিভাষায় রবীন্দ্রনাথ বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গারের কবি। পরবর্তী কালে আরো কাব্য সাহিত্যেই এই প্রেমদর্শন ফুটে উঠেছে। দেহ কামনা বাসনা সেখানে নেই - রয়েছে দেহাতীত প্রেমের অমৃত আস্বাদন।

পরিশেষে বলা যায়, 'নিষ্ফল কামনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত প্রেমদর্শনের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। দেহ প্রেমের ক্লেদাক্ত পথকে অতিক্রম করে বাসনাকে নির্বাসন করতে সমর্থ হয়েছেন কবি। এই দেহাতীত প্রেমের পথেই এরপর শুরু হবে তার পথ চলা। তার কাব্যসাহিত্য - সঙ্গীতে ফুটে উঠবে দেহাতীত প্রেমের অতুলনীয় সৌন্দর্য।

Scanned by CamScanner

৩. রবীন্দ্রনাথের চেতনায় কালিদাসের 'মেঘদূত' এর উপলব্ধি যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে তা মানসীর 'মেঘদূত' অবলম্বনে আলোচনা কর।

রবীন্দ্র কবি মানসের ওপর সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসের প্রভাব অপরিসীম। ১৮৯০ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ রচিত 'মেঘদূত' কবিতাটি তাঁর অন্যতম নিদর্শন। 'মেঘদূতম্' মহাকবি কালিদাসের অন্যতম একটি খণ্ডকাব্য। এই কাব্যে কালিদাস বিরহ কাতর যক্ষের বিচ্ছেদ বেদনা যেভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন বিশ্বসাহিত্যে তার উপমা বিরল। রবীন্দ্র কবিমানসও এই কাব্যের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছে।

বিশেষত রবীন্দ্রনাথ নিজেকে কালিদাসের উত্তরসূরী মনে করতেন। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের বিভিন্ন পর্বে 'মেঘদূত' এর প্রসঙ্গ এসেছে। রবীন্দ্র চেতনায় মেঘদূতম্ এর উপলব্ধি 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতা ছাড়াও 'চৈতালি' কাব্যের 'মেঘদূত', পুনশ্চ কাব্যের 'বিচ্ছেদ', 'শেষ সপ্তক' কাব্যের 'সপ্ত', 'লিপিকা' কাব্যের গদ্য কবিতা 'মেঘদূত' - প্রভৃতিতে রয়েছে। তছাড়াও তিনি মেঘদূতম্ এর উপলব্ধি ফুটিয়ে তুলেছেন 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'নববর্ষা' এবং 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে।

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় 'মেঘদূতম্' এর উপলব্ধি যেমন ভাবে উদ্ভাসিত এখন আমরা তা মানসীর 'মেঘদূত' অবলম্বনে আলোচনার চেষ্টা করছি —

রবীন্দ্রনাথের কালিদাস প্রীতি যে ছোটবেলা থেকেই ছিল তা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে জানা যায়। বিশেষ করে কালিদাসের মেঘদূতম্ কাব্যটি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত — পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। পূর্ব মেঘ খণ্ডে মেঘের যাত্রাপথের বর্ণনা রয়েছে। আর উত্তর মেঘ খণ্ডে মেঘ কীভাবে অলকাপুরীর সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করে যক্ষ প্রিয়ার কাছে উপস্থিত হয়েছিল তার বর্ণনা।

Scanned by CamScanner

কালিদাসের কাব্যে দেখা যায় যক্ষ বিরহিত যক্ষ আষাঢ়ের কাজল কালো মেঘ দেখে প্রিয়া মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিন্তু সে যক্ষরাজের প্রিয়ার কাছে যেতে পারে না। তাই সে নিজের বিরহ ও বার্তা প্রিয়ার কাছে পাঠানোর জন্য মেঘকে দূত রূপে পেতে চায়। আর এই ছবি রবীন্দ্র চেতনায় সুন্দর ভাবে ধরা পড়ে। যা তাঁর 'মেঘদূত' কবিতায় ফুটে ওঠে এইভাবে —

"বন্ধনবিহীন
নবমেঘপক্ষ - পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
. . . .
বিরহিনী ছিল শুয়ে দূতলশয়নে
মুক্ত কেশে, ম্লান বেশে, সজল নয়নে ?"

কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ছবি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের নদী যেমন - রেবা, শিপ্রা ও বেত্রবতীর বর্ণনা রয়েছে। আর এই নদীগুলির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চেতনার আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন মানসী-র 'মেঘদূত' কবিতায়। এইভাবে —

"কোথা রহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি ;"

তারপর বেত্রবতী নদীর তীরে আমগাছের ছায়ায় কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা দশার্ণ গ্রামের কথা এমনকি যে সব গৃহবলীভুক পাখিরা বর্ষার আগমনে নিজ নিজ বাসা বাঁধার জন্য ব্যস্ত থাকত সেই সব পাখিদের উপস্থিতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন —

কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা,

Scanned by CamScanner

পথতরুশাখে কোথা গ্রাম্য বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে
বনস্পতি ;"

এছাড়াও কালিদাসের কাব্যে যে সমস্ত গ্রাম্য বধূরা ভুরুবিলাস শেখেনি তাদের উল্লেখিত 'মেঘদূত' কবিতায় দেখা যায়। দেখা যায় কালিদাস তাঁর কাব্যে প্রাচীন ভারতের যে সমস্ত নদী-গিরি-নগরীর বর্ণনা করেছেন সেই সব নদী-গিরি নগরীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে করেছেন —

"সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর! অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য, কৈলাস, দেবগিরি, রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী।"

আবার কালিদাসের কাব্যে দেখা যায় রাজধানীর নির্জন পথের অন্ধকারে অভিসারিকারা অভিসারে বের হয়। আর সেই ছবি রবীন্দ্র কবি মানসে ফুটে ওঠে 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতায় —

"শুধু বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
কচিৎ বিদ্যুতালোকে।"

পরিশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ বার বার কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্য পাঠ করেছেন। ফলে তাঁর মনে বিভিন্ন চেতনার উদয় হয়েছে। আর এই চেতনা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন একাধিক রচনা। যার মধ্যে 'মানসী'-র 'মেঘদূত' কবিতাটি একটি।

Scanned by CamScanner

10×2 = 20

২. গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'চোর' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

নামে কী আসে যায়? গোলাপকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন সে সুগন্ধ দেবে। কিন্তু শেক্সপীয়ারের এই কথা সাহিত্যের নামকরণের ক্ষেত্রে খাটে না। সাহিত্যের নামকরণ অবশ্যই তাৎপর্য মণ্ডিত হবে। নামকরনে ফুটে উঠবে বিষয়বস্তুর ব্যঞ্জনা। কেননা নামকরণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। নামকরনের মাধ্যমে রচনার ভেতরের বক্তব্যটি ফুটে ওঠে। অর্থাৎ নামকরণ হল রচনার ভেতরে প্রবেশের চাবিকাঠি।

ঈশ্বরগুপ্তের সময় থেকে কয়েকজন মহিলা কবির কবিতা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু সেসব কবিতা ছিল কাব্য গুনে বঞ্চিত। উনিশ শতকের শেষের দিকে বেশ কয়েকজন মহিলা কবির কবিতা পাওয়া যায় - যাঁর পাঠক সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন মহিলা গীতিকবি হলেন - 'গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী'। গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল - 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম' 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭), 'আভাস' (১৮৯০), 'শিখা' (১৮৯৬), 'অর্ঘ্য' ইত্যাদি।

১৮৯৬ সালে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর রচিত 'শিখা' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ন গীতিকবিতা হল 'চোর'। এই 'চোর' কবিতাটির নামকরণ কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা আলোচনা করার চেষ্টা করছি —

'চোর' কথার সাধারন অর্থ হল "যারা চুরি করে" কিন্তু কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী আলোচ্য 'চোর' কবিতাটিতে তাঁর কোলের শিশু সন্তানটিকেই কবিতার সূচনাতে 'চোর' বলেছেন —

"কোথা হতে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর,
সর্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর।"

কবি বলেছেন তাঁর শিশুটি শুধু তাঁর সর্বস্ব চুরি করে নিয়েছে এমনকি তাঁর হৃদয়টিকেও চুরি নিয়েছে।

Scanned by CamScanner

ও তাঁর বুকে সিঁধ কেটে দিয়েছে।

কবি আরও বলেছেন তাঁর শিশু সন্তানটি তাঁর মুখের পান, আঁখির সিঁদুর, গলার হার, বাহুর কনকডোর সবকিছু অধিকার করে নিয়েছে। আকাশের চাঁদ যেন তার কপালে টিপরূপে শোভা পাচ্ছে। এমনকি কবির চোখের ঘুম, পেটের ক্ষুধা ও যৌবনের চারুস্তুকেও কেড়ে নিয়েছে। যা কবির ভাষায় এইরকম—

"~~কোথা হতে এলি রে হৃদে রে হৃদে সিঁধেল চোর~~

কিছু খুঁতে আর নাই,

সকলি তুহার চাই

মুখের তাম্বুলটুকু

আঁখির সিন্দুরটুকু

গলার হাঁসুলি হার— বাহুর কনক ডোর —

চাই আকাশের চাঁদ কপালের টিপ তোর।

হায়রে সিঁধেল চোর।"

কবির সেই হৃদে শিশুটি তার মাতৃহৃদয় থেকে সব কিছু হরন করে নিয়েছে কিন্তু তাতেও তার মায়ের কোনো দুঃখ হয়নি। ~~বরং~~ তার মা যেন তৃপ্ত ও আনন্দ বোধ করেছে।

এই কবিতাটিতে রয়েছে মাতৃহৃদয়ের আনন্দ, হাসি, ভেক আদরের বহিঃপ্রকাশ। মায়ের কাছে শিশুর স্নেহ যেন চির-পুরাতন আবার যেন চিরনতুন। পৃথিবীর সমস্ত মা যেমন তাদের সন্তানের মাধ্যমে সমস্ত দুঃখ বিষাদ ভুলে যায় তেমনি আলোচ্য 'চোর' কবিতায় কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীও তাঁর সন্তানকে ঘিরে তাঁর জীবনের সব দুঃখ-বিষাদ ভুলে গেছেন। তার তাই কবিতার শেষে তিনি লিখেছেন—

"কোথা হতে এলি তুই ওরে হৃদে চোর।

এই কান্না এই হাসি,

রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি;—

গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু-ডোর,

সর্বস্ব লইলি হরি হৃদে হৃদে চোর।"

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য 'চোর' কবিতায় ক্ষুদে ছুঁদে চোরটি নির্দ্বিধায় মায়ের বুকে সিঁধ কাটতে পারে ও অনায়াসে চুরি করতে পারে। আর এই চোরের জন্য মা সবকিছু বিসর্জন দিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করে না। এই চোরই যেন মায়ের সুখ ও শান্তি খুঁজে পাওয়ার একমাত্র স্থান। এমনকি এই চোরটিকে নিয়েই কবিতাটি তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আলোচ্য 'চোর' কবিতাটির নাম যথাযথ ও সার্থক।

Scanned by CamScanner